# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইউরোপীয়দের আগমনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য প্রকৃতি

ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ছিল। ক্যারাভান[১] ও সমুদ্র উভয় পথই বণিকরা ব্যবহার করত। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ অধিক গুরুত্ব পেত। স্বল্পপাল্লা ও দূরপাল্লা উভয় বাণিজ্যে বণিকরা অংশ নিত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে দস্যু-তস্করদের উপদ্রব সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। সহজ বহনযোগ্য মূল্যবান দ্রব্য পরিবহণে বণিকরা গুরুত্ব দিত। উভয় অঞ্চলেই মুসলমান বণিকদের আধিপত্য দৃষ্ট হত। বন্দর কর্তৃপক্ষ ও শাসকগণ বিদেশী বণিকদের সুযোগসুবিধা এবং নিরাপদ বাণিজ্যের ব্যবস্থা গ্রহণে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল উভয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপকভাবে অভ্যন্তরীণ লেনদেন পরিচালনা এবং সুসম্পর্ক স্থাপন।

### ক. ক্যারাভান বাণিজ্য

প্রাচীন ও মধ্য যুগে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থলপথে পরিচালিত বাণিজ্য সাধারণভাবে ক্যারাভান বাণিজ্য নামে অভিহিত হত। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিকরা ক্যারাভান পথ ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এবং মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণে ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্যারাভান পথের বিবরণ পাওয়া যায়। জাতকে ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণিত ১৬টি অভ্যন্তরীণ পথের বর্ণনা রয়েছে :

(ক) শ্রাবস্তী – সীমান্ত অঞ্চল (সম্ভবত গান্ধার রাজ্যের তক্ষশীলা)

(খ) বারানসী – শ্রাবস্তী

(গ) তক্ষশীলা - অন্ধ্রদেশ - বারানসী

---

[১] উট, অশ্ব, বলদ, শকট প্রভৃতি বাহিত মানুষ ও পণ্যের কাফেলা বা দল।

(ঘ) কুশীনগর (কাসিয়া, উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলা) – শাকল (পাঞ্জাবের শিয়ালকোট অঞ্চল)

(ঙ) বারাণসী – উজ্জয়িনী

(চ) বিদেহ (উত্তর বিহার) – গান্ধার (তক্ষশীলা অঞ্চল)

(ছ) বারানসী – রাজগৃহ

(জ) ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লি) – তক্ষশীলা

(ঝ) ভড্ডিয় (ভদ্রিকা) – শ্রাবস্তী

(ঞ) বেরঞ্জা – শ্রাবস্তী

(ট) দন্তপুর (কলিঙ্গ রাজধানী) – ইন্দ্রপ্রস্থ

(ঠ) দন্তপুর – পাতালি (বর্তমান নাম বোধন, অন্ধ্র প্রদেশের নিজামাবাদ জেলায়)।[২]

সময়ের পরিবর্তনে এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ পথেরও পরিবর্তন ঘটে। একাদশ শতাব্দীতে (আনুমানিক ১০৩৮ সাল) রচিত আল বিরুণীর লেখা গ্রন্থ থেকে তৎকালীন ভারতের স্থলপথ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আল বিরুণী কৌনজকে ভারতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ধরে এসব পথের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণে নিম্নোক্ত পথসমূহ বর্ণিত হয়েছে :

(১) কনৌজ হতে দক্ষিণমুখে এলাহাবাদ, তথা হতে পূর্ব উপকূল হয়ে কাঞ্চী (কাঞ্জীভরম্) এবং আরোও দক্ষিণ অঞ্চল।

(২) কনৌজ হতে পূর্বমুখে বারী (আগ্রার নিকটবর্তী একটি স্থান) হয়ে অযোধ্যা, বারাণসী এবং তথা হতে পূর্বমুখে পাটালিপুত্র, মুঙ্গের, চম্পা (ভাগলপুর) হয়ে গঙ্গার মোহনা গঙ্গাসাগর পর্যন্ত।

(৩) কনৌজ হতে বারী, তথা হতে বিহাট (আধুনিক বিহার রাজ্যের বেতিয়া) –ত্রিহুত–কামরূপ (আসাম)।

(৪) কনৌজ হতে দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গার পশ্চিমকূলে যাযাহুতি রাজ্য (বুন্দেলখণ্ডের যাঝোতি)। খাজুরাহো এই দেশের রাজধানী। এই স্থান হতে কালচুরি ও গাঙ্গেয়দের রাজধানী ত্রিপুরী

---

[২] গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, *প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়*, পরিবর্ধিত সং., (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম (প্রা. লি., ১৯৭৬), পৃ. ৩৪-৩৫।

(জব্বলপুর) হয়ে কর্ণাটক দেশের অন্তর্ভূক্ত সমুদ্রপোকূলবর্তী বনবাস (এই স্থানটি কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত) যাওয়া যায়।

(৫) কনৌজ হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অসি। অসি হতে রাজৌরি হয়ে (রাজোরগড়-আলোয়ার) বাজানা (ভরতপুর অঞ্চলের বায়ানা), বাজানা হতে নারায়ণ (সম্ভবত মাড়ওয়ারের ভিনমাল)।

(৬) কনৌজ হতে মথুরা-দুধাহি (ঝাঁসি জেলার ললিতপুরের নিকট)-ভিলসা-উজ্জয়িনী ও উজ্জয়িনী হতে মালব-রাজধানী ধার।

(৭) বাজনা হতে প্রায় ৯৩ মাইল দূরে মেবারের রাজধানী চিতোর। চিতোর হতে মালবের রাজধানী ধার ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৮) ধার হতে দক্ষিণমুখে নর্মদা তীর ধরে গোদাবরী তীরস্থ মন্দাগির পৌছানো যায়।

(৯) ধার হতে দক্ষিণমুখে মহারাষ্ট্র (কোঙ্কন অঞ্চল) দেশ হয়ে সমুদ্রতীরস্থ থানা বন্দর।

(১০) বাজনা হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে আনহিলবার (গুজরাট, বর্তমান পাটন) - পশ্চিম উপকূলে আবস্থিত সোমনাথ (কাথিয়াবাড়)।

(১১) আনহিলবার হতে দক্ষিণমুখে লাট দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী বিরোচ (ভারুকচ্চ, বরোচ্) ও রিহানজুর (নওসারি)।

(১২) বাজনা হতে পশ্চিমমুখে মুলতান-ভাটি হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সিন্ধু নদীর মোহনায় লোহারানী (করাচির নিকট)।

(১৩) কনৌজ হতে উত্তর পশ্চিম মুখে সিরসা (হিসার জেলা)-দাহমাল-ভাল্লাওয়ার হতে পশ্চিম মুখে লাড্ডা, লাড্ডা হতে রাজগিরি (রাজোরি ) হয়ে কাশ্মিরে পৌছানো যায়।

(১৪) কনৌজ হতে পশ্চিম মুখে মীরাট, পানিপথ (কর্ণাল জেলা), আটক, পেশোয়ার, কাবুল হয়ে গজনি পর্যন্ত যাওয়া যায়।

(১৫) সিন্ধু ও বিতস্তা (ঝিলম) নদীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বব্রহান হতে উস্কুর (প্রাচীন হুবিষ্কপুর) হয়ে কাশ্মিরের তৎকালীন রাজধানী অধিষ্ঠান পর্যন্ত যাওয়া যায়।

(১৬) আফগানিস্তানের দক্ষিণে সিন্ধুর মাকরান প্রদেশের রাজধানী তিজ হতে দেবল, দেবল হতে লোহারাণী, কচ্ছ, সোমনাথ, ক্যাম্বে, বরোচ, সোপারা, থানা, কাঞ্চী হয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যায়।[৩]

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে কয়েকটি অভ্যন্তরীণ পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বারাণসী-প্রয়াগ হতে রেওয়া রাজ্যের পার্শ্ব দিয়ে অমরকণ্টক হয়ে সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের রামেশ্বরগামী একটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে চুনার, বারাণসী, এলাহাবাদ, মধ্যভারত হয়ে কণ্টক ও তথা হতে রামেশ্বর পর্যন্ত অপর আর একটি পথ উল্লিখিত হয়েছে।[৪] তারিখ-ই-শেরশাহ গ্রন্থে সড়ক-ই-আজম নামে একটি বিস্তৃত পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্ত সোনার গাঁ হতে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যাকা পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত ছিল। সড়ক-ই-আজম বা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়াও শের শাহের সময় বহু নতুন পথ নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে (ক) আগ্রা হতে দক্ষিণগামী বুরহানপুর পথ; (খ) আগ্রা হতে যোধপুর চিতোর পথ; (গ) লাহোর হতে মূলতান গামী পথ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল।[৫] সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ভারতের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা থেকে পূর্বে বার্মার সীমান্ত পর্যন্ত অসংখ্য স্থল বা ক্যারাভান পথ বিস্তৃত ছিল।

সুলতানি আমলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা জন্য অসংখ্য রাস্তাঘাট এবং বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ছোট ছোট হাটবাজার থেকে বণিকরা পণ্য সংগ্রহ করে বড় বড় শহরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে প্রেরণ

---

[৩] গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৪।

[৪] *তদেব*, পৃ. ৭৪।

[৫] *তদেব*, পৃ. ৯২-৯৩।

করত। সুলতানি ভারতে বড় বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর মধ্যে রাজধানী দিল্লী অন্যতম ছিল। ভারতের অন্যান্য স্থান হতে এখানে চাউলসহ বিভিন্ন ধরণের পণ্য আমদানি হত। মুলতান থেকে বিভিন্ন পণ্য দিল্লী আসতো এবং দিল্লী থেকেও রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্য মুলতান যেত। দিল্লী ছিল সুলতানি যুগের সবচেয়ে বড় ঘোড়া ও ক্রীতদাসের বাজার। খোরাসানি বণিকরা এজন্য মূলতান নয়, সরাসরি দিল্লী এসে বাণিজ্য করতে চাইত।[৬] রাজধানী দিল্লীর খাদ্য শস্যের যোগান আসত আমরোহা থেকে, পানীয় (মদ) আসতো আলীগড় ও মীরাট থেকে। পান আসত মালবের ধার থেকে। অযোদ্ধা থেকে সাধারণ কাপড় আসত, দেবগিরি থেকে মসলিন, আর ছাপা কাপড় সরবরাহ হত লখনৌতি থেকে।[৭] দিল্লীর পরেই ছিল দেবগিরী বা দৌলতাবাদ শহর। মুহম্মদ বিন তোগলকের রাজত্বকালে কিছু সময়ের জন্য ইহা ভারতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। ইবনে বতুতা বলেন, এ শহরের অধিবাসীরা প্রায় সবাই ধনী, এরা মণিমুক্তার ব্যবসা করে। এ শহরে গায়ক-গায়িকাদের একটি বাজার আছে। শহরের দোকানগুলো সর্বদা সুন্দর করে সাজানো এবং নানা অলংকারে সজ্জিত থাকে বলেও ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন।[৮] অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র ও বড় বড় বাজারের মধ্যে মুলতান, বারানসী, কৌনজ, উজ্জয়িনী, লখনৌতি, সোনারগাঁ উল্লেখযোগ্য ছিল।

ভারতের অভ্যন্তরে পণ্য পরিবহনের জন্য ক্যারাভান বণিকরা শস্য কিনে বলদের পিঠে চাপিয়ে দিল্লীতে নিয়ে আসত বলে বারানী উল্লেখ করেছেন। নাসিরুদ্দিন নামক সমকালীন আর একজনের ভাষায় এরা হলো নায়ক বণিক। দশ থেকে বিশ হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে এরা গ্রাম থেকে শহরে শস্য নিয়ে আসত।[৯] ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন, তিন হাজার বলদের পিঠে চাপিয়ে আমরোহা থেকে দিল্লীতে ত্রিশ হাজার মন শস্য আনা হতো। ইবনে বতুতা আরো জানিয়েছেন যে, ভারী ও আয়তনে বিশাল পণ্য পরিবহণের জন্য বলদ ব্যবহার করা হত।[১০] বারানী উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আলাউদ্দীন খলজী

---

[৬] *C E H I*, p. 82.

[৭] *Ibid*, p. 84.

[৮] *Ibn Battuta*, p. 228.

[৯] *C E H I*, p. 83.

[১০] *Ibid*.

দিল্লীতে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তিনি ক্যারাভানীদের সম্পত্তি ও পরিবার জামিন হিসেবে রাখতেন। তাছাড়া সুলতান নায়ক বণিকদের অগ্রিম মূল্য ও বহুমূল্য পোষাক দিয়ে দিল্লীতে নিয়মিতভাবে শস্য প্রদানে বাধ্য করেন।[১১] শহরগুলো থেকে গ্রামে বিশেষ কিছু যেত না। গ্রামবাসীদের ব্যাপক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করে নগদ অর্থ বলতে তেমন কিছু থাকত না। সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রামের কুটির শিল্পগুলোতেই উৎপন্ন হত। গ্রামবাসীরা বস্ত্রসহ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণত গ্রাম্য বাজার এবং মৌসুমি ও বাৎসরিক মেলা থেকেই সংগ্রহ করত।

স্থলপথের সঙ্গে সঙ্গে নদীপথ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। কাশ্মির, বাংলা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে নদীপথের বহুল প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মিরে প্রায় ৩০,০০০ নৌকা ছিল। একই সময়ে সিন্ধুতে ছিল প্রায় ৪০,০০০ নৌকা।[১২] খাদ্যশস্য, চিনি, ঘি, লবণ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল।[১৩]

দক্ষিণ এশিয়ার ন্যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিকাশ লাভ করেছিল। মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রধানত স্থলপথ ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে চাষাবাদের জন্য গৃহপালিত পশু (বলদ ও মহিষ) ব্যবহারের কথা জানা যায়।[১৪] ফলে স্থলপথে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার ন্যায় বলদের ব্যবহার হত তা স্পষ্ট অনুমান করা যায়। মূল ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বীপাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম ছিল সমুদ্রপথ। এক্ষেত্রে নৌকা ছিল তাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নৌপথের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলোতে নৌশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশে এ অঞ্চলীয় বৈদেশিক বাণিজের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রাচীনকাল থেকে ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা, টিন, সীসা, দামী পাথর, মূল্যবান কাঠ ইত্যাদি রপ্তানি হত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য

---

[১১] *C E H I*, p. 83..

[১২] P. N. Chopra and others, *op. cit.*, p. 114.

[১৩] *Ibid.*

[১৪] জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

প্রাচীনকাল থেকে গুজরাটি ও করমন্ডলীয় বণিকরা মূল ভূখণ্ডের মালয় উপদ্বীপের কেদাহ এবং সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের বিভিন্ন বন্দরকে বেছে নিয়েছিল। মূল ভূখণ্ডের ও দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলো ভারতীয় বণিকদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য সমুদ্র পথে উল্লিখিত বন্দরসমূহে যাতায়াত করত। অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে আরব এবং গুজরাটী মুসলিম বণিকরাও একই পদ্ধতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্য সংগ্রহ করত। আরব ও গুজরাটি বণিকরা প্রথমে সুমাত্রাকে কেন্দ্র করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালাক্কার উত্থানের পরে ইহা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। গুজরাটী ও আরব বণিকদের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মালাক্কার মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মালাক্কার বৈদেশিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের এবং দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলোর মালাক্কার সঙ্গে যোগাযোগও বৃদ্ধি পায়।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও বণিকদের ব্যবসায়ীক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হত যাতে তারা পণ্যে ভেজাল ও ওজনে কম দিতে না পারে। দিল্লীর সুলদাসগণ অসাধু ব্যবসায়ী ও বণিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী যেসব ব্যবসায়ী তাদের পণ্যে ভেজাল দিত অথবা ওজনে কম দিত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। বাজার তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল শাহানা-ই-মান্দি নামক কর্মচারী । ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়।[১৫] কোনো ব্যবসায়ী ওজনে কম দিলে যে পরিমাণ দ্রব্য ওজনে কম দিত ঠিক সেই পরিমাণ মাংস ঐ ব্যবসায়ীর শরীর থেকে কেটে নেওয়া হত। সুলতানের আদেশে বিনাশুল্কে ব্যবসা, মুনাফাবৃত্তি ও চোরাকারবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।[১৬]

মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রধানত সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হলেও ক্যারাভান পথ অপ্রচলিত ছিল না। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রবাণিজ্য প্রচলের পূর্বে সিরিয়া, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া, মেসোপটেমীয়া (ইরাক), পারস্য (ইরান) এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে অঞ্চলদুটোর মূলত ক্যারাভান পথে বাণিজ্য পরিচালিত হত। সিন্ধুর নিম্ন উপত্যাকা

---

[১৫] D. G. E. Hall., *op. cit.*, p. 273.

[১৬] এ. কে. এম. আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*,৩য় সং. (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৭১।

থেকে শুরু হত ক্যারাভান পথটি। উত্তরে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত (বিস্তৃত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। সুলতানি শাসনামলে মঙ্গল আক্রমণের জন্য ক্যারাভান পথে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্যারভান পথের প্রধান পণ্য ছিল ঘোড়া এবং রপ্তানি পণ্য ছিল ক্রীতদাস।[১৭] দিল্লী ছিল ভারতের ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের সর্ববৃহৎ বাজার। ঘোড়ার ব্যবসা বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে উল্লেখ আছে, মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী যখন কয়েকজন অশ্বারোহীসহ বাংলার রাজধানী নদীয়ার নগরদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনিই যে বখতিয়ার খলজী এমন ধারণা রাজপ্রাসাদের কেহই করেননি।[১৮] সকলের ধারণা হয়েছিল তাঁরা বণিকদল এবং মূল্যবান অশ্ব বিক্রয়ের জন্য এসেছেন।[১৯] উপরোক্ত তথ্য থেকে মধ্য এশিয়ার অশ্ব বাণিজ্য যে বাংলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। তুর্কিস্তান থেকে ভারতে ঘোড়া আমদানি হত। হিমালয় অঞ্চল থেকেও বাংলায় ঘোড়া আসত। তবে মধ্য এশিয়ার ঘোড়ার ন্যায় ততটা উন্নত ছিল না। কাবুল থেকে ভারতে আসত বিভিন্ন ধরণের ফলমূল। ভারত থেকে যেত বস্ত্র, কম্বল, চিনি, নীল ও ঔষধি গাছ।[২০]

ক্যারাভান পথে পরিচালিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য মুলতানি, খোরাসানি ও ইরানি বণিকদের হাতে প্রধানত নিবদ্ধ ছিল।[২১] ক্যারাভান পথে বণিকদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখিন হতে হত। এ পথে ভারবাহী পশুর পিঠে বেশি পরিমাণে পণ্য পরিবহন করা যেত না। অধিকাংশ রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা ও রাস্তার দুপাশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে এ সব রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে পড়ত এবং রাস্তার বিভিন্ন স্থানে খাল ও গর্তের সৃষ্টি হত। এ সব খাল ও গর্তে প্রায়ই যাত্রী ও পণ্যসহ ভারবাহী পশুগুলো দুর্ঘটনার সম্মুখিন হত। আবার শুস্ক মৌসুমে হাটু পরিমাণ ধূলাবালিতে ভর্তি হয়ে ক্যারাভান পথ বণিকদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। মধ্য এশিয়ায় ক্যারাভান পথের অবস্থা আরো ভয়াবহ ছিল।

---

[১৭] *C E H I*, p. 84.

[১৮] *তবকাত-ই-নাসিরী*, পৃ. ২৬।

[১৯] তদেব, পৃ. ২৬-২৭।

[২০] P. N. Chopra & others, *op. cit.*, p. 111.

[২১] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খ., *প্রাচীন যুগ হইতে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত*, পুনর্মুদ্রণ (কলকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৫), পৃ.১৭৫।

পর্বতশঙ্কুল পথে শীতকালে প্রচন্ড শীত ও তুষারপাত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও তাপের ঝলশানি ভারবাহী পশু ও যাত্রীদের অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াত এবং যাত্রাপথে বিলম্ব ঘটাত। পশ্চিম এশিয়ার মরুপথগুলোতেও বণিক ও কাফেলাসমূহকে প্রচন্ড খরা ও রৌদ্রের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হত। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে বণিক ও যাত্রীগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় জর্জরিত হয়ে পড়ত।

ক্যারাভানগুলো পরিচালনার জন্য একজন দলপতি থাকত। সাধারণত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দলপতি হত। বিশেষ করে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। ক্যারাভান দলপতি ঝুঁকিপূর্ণ এবং জনশুন্য জনপদসমূহের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রমকালে ক্যারাভানগুলোকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করত।[২২] এসব কারণে সম্ভবত জনসমাজে বিশেষত বণিক সমাজে ক্যারাভান দলপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল অপরিসীম। সরকারীভাবে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় দস্যু-তস্করদের উপদ্রব থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য বণিকরা নিজেরাই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করত। দস্যুদের হাত থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য স্থলপথে বণিকরা তাদের সাথে ভাড়াটিয়া বাহিনী রাখত। ভাড়াটিয়ারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত ক্যারাভানগুলোর সাথে সাথে যেত এবং নিরাপদে পণ্যসহ বণিকদের পৌছিয়ে দিত। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় বণিক দলের সাথে আজ্ঞাবহ ভৃত্য থাকত।

### খ. সমুদ্রবাণিজ্য

মধ্যযুগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে মূলত সমুদ্রবাণিজ্য বোঝাতো। একদিকে সমুদ্রপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী একদিকে উভয় অঞ্চলের মধ্যে, অন্যদিকে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এবং আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে পরিবাহিত হত। সমুদ্রপথে পরিচালিত এ বাণিজ্য সমুদ্রবাণিজ্য নামে অভিহিত ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় মালাবার ও করমন্ডল উপকূলীয় বন্দরসমূহ ও বাংলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কা সমুদ্র বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

রোমান আমলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার ঘটে (বিস্তৃত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরব মুসলমানদের নেতৃত্বে ইহা স্থায়ী

---

[২২] Al Basham, *The wonder that was India* (London : Sidgwick and Jackson, 1954), p. 225.

রূপ লাভ করে। ইসলামের অভ্যুদয়ের মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আরব মুসলমানরা আরব উপদ্বীপসহ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করে বিশাল বাণিজ্যবলয় গড়ে তুলে। আরব বণিকরা আরব বিশ্ব ও ইউরোপীয়দের জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো হতে সরাসরি প্রচুর পরিমাণে মশলা ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে থাকে। আরব বণিকরা পণ্য সংগ্রহের জন্য চীন পর্যন্ত গমন করত। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৭১২ খি.) সিন্ধু পর্যন্ত আরবদের সাম্রাজ্য সীমা বিস্তার লাভ করেছিল। সুতরাং আরবরা ইচ্ছা করলে পারস্য-সিন্ধু হয়ে স্থলপথে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। কিন্তু স্থলপথে যাত্রী ও ভারবাহী পশুর দুর্দশা, চোরডাকাতের উপদ্রব, যাত্রাপথের দূদর্শা প্রভৃতি কারণে আরব বণিকরা স্থলপথের পরিবর্তে সম্ভবত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে সমুদ্রপথ বেছে নেয়। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কারণে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন তাদের জন্য সহজ ছিল। সমুদ্রপথেও তখন জলদস্যুদের উপদ্রব ছিল, তবে তা স্থলপথের তুলনায় অনেক কম ছিল। তাছাড়া সমুদ্রপথে স্থলপথের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে পণ্য পরিবহণ সম্ভব হত।

সিন্ধুতে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা, নবম শতাব্দীর মধ্যে গুজরাটে বাণিজ্যবসতি নির্মাণ ও সেখানকার বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা আরবদের সমুদ্র বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি মুসলমানগণ কর্তৃক সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমুদ্রপথে আরবদের বাণিজ্য পরিচালনা স্থায়িত্ব লাভ করে। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা এবং জাভায় আরব বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল এবং পারলাক, পাসাই, গ্রেসিক প্রভৃতি বন্দররাজ্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরব জাহাজগুলো মালাবার ও করমন্ডল উপকূলে অবস্থিত বন্দরসমূহ হয়ে এলি, কুইলন, কালিকট, কোচিন, কয়াল, মেলিপাতন, নেগাপতন, পাড়ি দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হত এবং বাংলা, সিংহল এবং সুমাত্রা ও জাভার বন্দরসমূহ হয়ে চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য মালাক্কার উত্থান ঘটলে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্য 'মৌসুমি' নামক একটি নিয়মাবদ্ধ বায়ু দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (৪৭ খ্রি.) হিপলাস (Hippalus) নামক জনৈক গ্রিক নাবিক

সর্বপ্রথম পর্যায়ভিত্তিক এই মৌসুমি বায়ুর গতিপথ আবিষ্কার করেন।[২৩] আফ্রিকার পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যে নিয়মিতভাবে এ বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। মৌসুমি বায়ু দুটি পর্যায়ে প্রবাহিত হয়। একটি উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু যা নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে। অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু যা এপ্রিলের শেষ হতে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে।[২৪] আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে ভারতীয় উপকূল হয়ে চীন সাগরের দিকে এ বায়ু প্রবাহিত হয়। মধ্যযুগে এই মৌসুমি বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করেই দেশী-বিদেশী বণিক ও পর্যটকরা ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজ চালনা করত।

মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ পর্যন্ত নাবিক ও বণিকরা তাদের জাহাজগুলোকে গন্তব্যের পথে চালিত করত। বায়ু পড়ে গেলে নাবিক ও বণিকরা নিকটবর্তী কোনো নিরাপদ বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করত এবং অনুকূল বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করত। এ অপেক্ষা কখনও কখনও মাসের পর মাস চলতে থাকত। মার্কো পোলো চীন থেকে সমুদ্রপথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে সুমাত্রায় পৌঁছে অনুকূল মৌসুমি বায়ুর অভাবে সেখানে প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন।[২৫] বস্তুত নিয়মাবদ্ধ এই মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করেছিল।

বন্দর ব্যবহার করা সমুদ্রবাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় বণিক ও পণ্য উৎপাদনকারীগণ ক্যারাভান ও নৌ-পথে দেশের দূরদূরান্তে অবস্থিত হাট-বাজার, গঞ্জ হতে পণ্য সংগ্রহ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে নিয়ে আসত। বন্দরগুলো তখন অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বণিকদের পণ্য লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এ সব বন্দর থেকে জাহাজযোগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্যসামগ্রী এশিয়ার অন্যান্য অংশে ও ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রেরিত হত। তাছাড়া বিদেশী বণিকদের

---

[২৩] E. H. Warmington, *The Commerce between the Roman Empire and India*, 1st pub. London, 1974, Indian ed. (Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1974), pp. 47-48.

[২৪] *Ibid*, pp. 48-49.

[২৫] *Marco Polo*, p. 339.

সঙ্গে নিয়ে আনা পণ্যের বাজার খোঁজা ও পণ্য বিক্রয়, প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়, বিক্রয়লব্ধ ও সংগৃহীত পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, জাহাজ মেরামত, খাদ্য ও পানি সংগ্রহ ইত্যাদি কারণে সমুদ্র তীরবর্তী কোনো নিরাপদ বন্দরের প্রয়োজন হত।[২৬] এভাবে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলভাগ থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া, জেদ্দা, এডেন, মাস্কাত, হরমুজ, সিরাফ, মূলতান, ক্যাম্বে, কালিকট, কুইলন, মেলিপতন, নেগাপতন, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, পেগু, পাসাই, মালাক্কা প্রভৃতি অসংখ্য সমৃদ্ধ বন্দরের উদ্ভব ঘটে।

বণিকরা সর্বদা সমুদ্রউপকূল বরাবর অগ্রসর হত। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য শক্তিশালী জাহাজের অভাব এবং পর্যাপ্ত ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব সম্ভবত জাহাজগুলিকে উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে বাধ্য করত। এতদসঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিল নিয়মাবদ্ধ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব। যন্ত্রচালিত জাহাজের আবিষ্কার না হওয়ায় মৌসুমি বায়ুর উপর ভিত্তি করে বণিকদের জাহাজ পরিচালনা করতে হত। গভীর সমুদ্রপথে চলতে গিয়ে যেকোনো সময়ে এ বায়ু পড়ে গেলে বণিকদের নানা ধরণের সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের সিন্ধু বিজয় এবং সমুদ্র উপকূলে রণতরী মোতায়েনের ফলে সিন্ধুর উপকূলবর্তী এলাকায় জলদস্যুতা কিছুটা হ্রাস পায়। তাছাড়া উপকূলীয় রাজাগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেও জলদস্যুদের উপদ্রব অনেক হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু গভীর সমুদ্রে তা পূর্বের মতই অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য যে, দিল্লীর সুলতানগণ স্থলপথের নিরাপত্তা গ্রহণে যতটা যত্নবান ছিলেন, নৌবাহিনী গঠনে আদৌ তৎপর ছিলেন না। সমুদ্রপথে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভবনা না থাকায় ভারতীয় সুলতানগণ নৌবাহিনী গঠন, সমুদ্র পথের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতির দিকে আগ্রহী ছিলেন না। বণিকরা গভীর সমুদ্রপথ পরিহার করে বাধ্য হয়ে উপকূলীয় পথে বাণিজ্য পরিচালনা করত।

বিদেশী বণিকরা পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্যও সর্বদা উপকূল বরাবর অগ্রসর হত। আরব বণিকগণ এই দুঅঞ্চলে আগমনকালে তাদের সঙ্গে বিপুল পরিমাণে পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও ইউরোপের তৈরি জিনিসপত্র আনত। এ সব পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার খোঁজা এবং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করার জন্য তাদের উপকূলীয় বিভিন্ন বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রে অবস্থান করতে হত। এছাড়া জাহাজ

---

[২৬] K. N. Chaudhuri, *Trade and Civilization in the Indian Ocean* (Cambridge : Cambridge University Press, 1985), pp. 102-103.

মেরামত, পানি ও খাদ্য সংগ্রহ, পণ্যের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য গুদাম ভাড়া প্রভৃতি কারণে তাদের উপকূলীয় বন্দরসমূহে অবস্থান গ্রহন করতে হত।[২৭] এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যরত বণিকদের উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনা করতে হত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে কম্পাসের ব্যবহার এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের পর এ অঞ্চলে গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

গ. স্বল্পপাল্লা ও দূরপাল্লার বাণিজ্য

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য ছিল মূলত স্বল্পপাল্লার বাণিজ্য। একদিকে স্থলপথে পর্যাপ্ত রাস্তাঘাটের অভাব, পথিমধ্যে ক্লান্ত বণিক ও ভারবাহী পশুর জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধান, দস্যুতস্করদের উপদ্রব হতে রক্ষা, রাষ্ট্রগুলোর উপর কেন্দ্রীভূত শাসনের অভাব ইত্যাদি, অন্যদিকে সমুদ্রপথে একটানা দূরবর্তী পথ অতিক্রম করার মতো শক্তিশালী জাহাজের অভাব, বণিকদের নিয়ে আনা পণ্যের বাজার খোঁজ করা ও নতুন পণ্য সংগ্রহ করা, জাহাজ মেরামত, খাদ্য-পানির ব্যবস্থা, অনুকূল বায়ুপ্রবাহ (মৌসুমি বায়ু) প্রভৃতি কারণে বণিকদের বাধ্য হয়েই স্বল্পপাল্লার বাণিজ্য পরিচালনা করত। সাধারণত কোনো বন্দরে বণিকদের আগমনের পর সেখানে প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ক্রয়বিক্রয়পর্ব শেষ হলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে তারা পরবর্তী বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করত। এভাবে তারা এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশ হয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে গমন করত। এভাবে প্রাচীনকাল থেকে স্বল্পপাল্লার মাধ্যমে বণিকরা আন্তঅঞ্চলীয় বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি আন্তঃমহাদেশীয় তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। পরিশিষ্টে মধ্যযুগে ব্যবহৃত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যপথের একটি মানচিত্র ( মানচিত্র নং ২) সংযোজন করা হল।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের উত্থান এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনায় প্রাধান্য দিলে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আরবরা ব্যাপকভাবে পণ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও চীনে যাতায়াত শুরু করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম সালতানাত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এশীয় অঞ্চলে দূরপাল্লার

---

[২৭] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, pp. 37-38.

বাণিজ্যের সম্প্রসারণে আরো কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। আরব ও পারসিক জাহাজগুলো লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা আরম্ভ করে মালাবার উপকূলীয় বন্দরসমূহে আসত। এ সময়ে গুরজাটের ক্যাম্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেখানে পশ্চিমা বণিকরা কিছু পণ্য ক্রয়বিক্রয় করে জাহাজ নিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হত এবং কখনো বাংলা হয়ে, কখনো শ্রীলঙ্কা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যেত, এমনকি এভাবে তারা চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত অগ্রসর হত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাক্কার উত্থানের পরে আরবদের দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাণিজ্য মালাক্কাকেন্দ্রীক হয়ে উঠে এবং মালাক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উৎপাদিত মশলা ও অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য এবং চীনের তৈরি জিনিসপত্র সংগ্রহ করে স্বদেশে ফেরত যেত। ফিরতিপথে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা ও চীনা পণ্যসামগ্রী ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, বাংলা এবং গুজরাট থেকে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করত। আরবরা গুজরাটি ও করমন্ডল উপকূলীয় বণিকদের কাছ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করত। গুজরাটি ও করমন্ডল উপকূলীয় বণিকরা আরবদের জন্য পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বাংলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যাতায়াত করত। সংগ্রহীত পণ্যাদী নিয়ে আরব ও অন্যান্য পশ্চিম এশিয়ার বণিকরা লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় পথে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার বাগদাদ, দামেস্ক, আলেপ্প, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, তিউনিসিয়া, মরোক্ক, কন্সট্যান্টিনোপল, আর্মেনিয়া, ট্রিবজন্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দুরবর্তী দেশ ও অঞ্চলে প্রেরণ করা হত। এভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বল্পপাল্লার বাণিজ্য আঞ্চলিক পরিসর ছাড়িয়ে আন্তঃমহাদেশীয় তথা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বস্তুত ইউরোপীয়দের এশীয় অঞ্চলে আগমনের পূর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বল্পপাল্লার ও দূরপাল্লার বাণিজ্য যুগপৎভাবে বিদ্যমান ছিল।

### ঘ. দস্যুতস্করদের উপদ্রব

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উভয় অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে দস্যুতস্করদের উপদ্রব লক্ষণীয় ছিল। দস্যুরা বণিক ও যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত হত না, যাত্রীগণের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটাত। ইবনে বতুতা মুলতান থেকে দিল্লী যাত্রাকালে আবোহর নামক শহর

পরিত্যাগের পর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রমকালে একদল দস্যু কর্তৃক তাঁর সঙ্গীরাসহ আক্রান্ত হন এবং দস্যুদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনহানি ঘটে।[২৮] মেওয়াটি, কামপিল, পাতিয়ালা, ভোজপুর প্রভৃতি এলাকার দস্যুদের দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তিতে সুলতানি ভারতের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। মেওয়াটি দস্যুদের উৎপাত এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাদের ভয়ে রাস্তাঘাটে বণিক ও জনগণ পথ চলতে সাহস করত না। এমনকি দিল্লী শহরের চতুষ্পার্শের লোক নামাজের সময়ও ঘরের দরজা বন্ধ রাখত। নামাজের পরে কোনো বুজর্গ ব্যক্তির মাজার জিয়ারত করতে কিংবা সুলতানি হাউজের কিনারায় বেড়াতে যেতে কারোর সাহস হত না।[২৯] সুলতান বলবন মেওয়াটি দস্যুদের প্রধান আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত জঙ্গলসমূহ পরিষ্কার করেন, শত শত মেওয়াটি দস্যুকে তরবারির মুখে নিক্ষেপ করেন, তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠন, সহায় সম্পত্তির ধ্বংশ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে কঠোরভাবে এ দস্যুদের দমন করেন। দিল্লীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন থানা নির্মাণ করেন এবং দুর্ধর্ষ আফগান দলপতিদিগকে থানাসমূহের নেতৃত্ব দেন।[৩০] তিনি নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে কামপিল, পাতিয়ালা, ভোজপুর, কাথিয়াড় প্রভৃতি স্থান দস্যুমুক্ত করেন। দস্যুদের আশ্রয়স্থলের মাঝে মাঝে তিনি আফগান সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। এভাবে সুলতান বলবন দস্যুদের দমন করে দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।[৩১]

স্থলপথের ন্যায় সমুদ্রপথেও দস্যুবৃত্তি ঘটত। জলদস্যুদের উপদ্রবে পারসিকরা মাঝেমধ্যে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ রাখত। এমনকি তারা সমুদ্র তীরেও কোনো বন্দর নির্মাণ করেনি।[৩২] ভারতীয় পশ্চিম উপকূলভাগ জলদস্যুদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল। দস্যুতার প্রধান কারণ হিসেবে হিসেবে কে. এন. চৌধুরী এশিয়ার দেশগুলোর খন্ডবিখন্ডতা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবকে দায়ী করেছেন।[৩৩] কে. এন. চৌধুরীর এ মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ভারতবর্ষ মুসলিম সালতানাত

---

[২৮] *Ibn Battuta*, pp.190-191.

[২৯] *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, পৃ. ৪৪।

[৩০] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

[৩১] তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৩২] দৃগাদাস লাহিড়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

[৩৩] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 14.

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে না ছিল কোনো ঐক্য, না ছিল সম্প্রীতি। তারা সর্বদা একে অপরের রাষ্ট্র দখল এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের এ অস্থিতিশীলতার সুযোগে দস্যুরা স্থলভাগে এবং জলপথে সাধারণ যাত্রী এবং বণিকদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ যা থাকত সব লুট করে নিত। ভারতবর্ষে এককেন্দ্রীক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর সুলতানগণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে স্থলপথে দস্যুতস্করের উপদ্রব কমলেও সমুদ্রপথে তা কমেনি। এর কারণ ছিল মূলত ভারতের দক্ষিণ উপকূলভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের যথার্থ নিয়ন্ত্রণের অভাব। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় সমগ্র দাক্ষিণাত্য তথা সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো বিজিত হলেও সেগুলো সুলতানের আনুগত্য স্বীকার ও বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে প্রায় স্বাধীনভাবে থাকত। সমুদ্র উপকূলবর্তী একমাত্র সিন্ধু ও গুজরাট দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ মঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে স্থলপথ রক্ষা ও সেনাবাহিনীর প্রতি মনোযোগ দিতেন। সমুদ্রপথে কোনো বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে নৌবাহিনী গঠনের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাছাড়া সুলতানি ভারতে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাণিজ্য পরিচালিত হত না। বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণে অবশ্য কোনো কোনো দেশের সুলতানদের ব্যক্তিগতভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে বাণিজ্য পরিচালিত না হওয়ায় সমুদ্রপথে জলদস্যুদের দমনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হত না। এমনকি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলেও জলদস্যুদের দমন করতে অথবা সমুদ্রপথে বণিকদের আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করতে সুলতানগণ সচেষ্ট হতেন না।[৩৪]

উপকূলবর্তী সামন্ত অথবা স্বাধীন সুলতানগণ নিজেদের স্বার্থে নৌবাহিনী করলেও পর্যাপ্ত নৌযান ও নৌসেনার অভাবে তাদের পক্ষে সমুদ্রপথে নিয়মিত টহল দেয়া ও জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। উপকূলীয় রাজ্যগুলো এ ব্যাপারে সমন্বিত কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করতে পারেনি। আর এজন্যই দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা যখন বিভিন্ন উপকূলবর্তী দেশ দখল এবং এশীয় বণিকদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন করে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে তখন

---

[৩৪] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 14.

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিকভাবে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।[৩৫]

রোমান আমলে ভারতে যখন থেকে মৌসুমি বায়ুর আবিষ্কার হয় তখন থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুতা ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তিতে রোমানদের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে গ্রীক-রোমান জাহাজগুলো জলদস্যুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং তখন থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুতা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। উমাইয়া খলিফা ১ম ওয়ালিদের সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সিংহলরাজ প্রেরিত ৮টি পণ্যভর্তি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার কথা সর্ববিদিত।[৩৬]

জলদস্যুরা অভিনব উপায়ে দস্যুবৃত্তি করত। মার্কো পোলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, জলদস্যুদের শ'খানেক ছোট ছোট জাহাজ থাকত। সমুদ্রে কোনো জাহাজকে যেতে দেখলে তারা ছুটে গিয়ে জাহাজটিকে লুট করত। যাতে কোনো জাহাজ তাদের দৃষ্টি এড়াতে না পারে সেজন্য তারা জাহাজগুলিকে পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর নোঙ্গর করে রাখত। এতে একশত মাইল জুড়ে কুড়িখানা জাহাজ থাকত। কোনো জাহাজের জলদস্যুরা দূরে কোনো বণিকের জাহাজকে যেতে দেখলে অমনি তাদের জাহাজে আগুন জ্বালিয়ে বা ধোঁয়া ছেড়ে বণিকের জাহাজ আসার সংবাদ সংকেতে অন্য জাহাজগুলোকে জানিয়ে দিত। অমনি জলদস্যুদের জাহাজগুলো বণিকদের জাহাজ লুট করতে ছুটে যেত।[৩৭] মার্কো পোলো গুজরাটের জলদস্যুদের বেপরোয়া ও নৃশংস জলদস্যু হিসেব অভিহিত করে বলেন, যখন তারা কোনো বাণিজ্যজাহাজকে অবরোধ করে, তখন সাগরের পানিতে তেঁতুল গুলে সেই তেঁতুল পানি জাহাজের সব সওদাগরকে জোর করে গিলিয়ে দেয়, যাতে মূল্যবান পাথর, মুক্তা ইত্যাদি যদি সওদাগরেরা গিলে ফেলে থাকে তাহলে সেটা পেট থেকে বের করে আনা যায়।[৩৮]

---

[৩৫] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 14.

[৩৬] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

[৩৭] *Marco Polo*, p. 382.

[৩৮] *Ibid*, p. 384.

ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলীয় বহু রাজা দস্যুদের পৃষ্টপোষকতা করত এবং অনেক সময় নিজেরাই দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে থানা থেকে জলদস্যুরা বণিকদের পণ্য লুণ্টন করার অভিযানে অগ্রসর হত। রাজার সঙ্গে তাদের এরূপ গোপন চুক্তি থাকত, লুণ্ঠনকৃত পণ্যের মধ্যে সব ঘোড়া হবে রাজার। এ রাজ্যের নিজস্ব ঘোড়া না থাকায় সৈন্যবাহিনীর জন্য রাজার এসব ঘোড়ার দরকার হত।[৩৯] চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যানারার অন্তর্গত ফাকানুর (বাকানুর) শহরের শাসক ছিলেন হিন্দু। কিন্তু তাঁর জাহাজসমূহ লুলু নামক একজন মুসলমান কর্তৃক পরিচালিত হত। ইবনে বতুতা লুলুকে একজন লুঠতরাজকারী, জলদস্যু হিসেবে উল্লেখ করেন। লুলুর অধীনে ছিল ত্রিশটি জাহাজ।[৪০] হিনওয়ারের (হেনোভার) সুলতান জামাল উদ্দীন ব্যবসা-বাণিজ্য, জলদস্যুতা এবং উপকূলভাগে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৪১]

জলদস্যুরা বণিক ও যাত্রীদের মালামাল ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন নিঃস্ব করে দিত, এমনকি প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটাত। ইবনে বতুতা কাওলাম (কুইলন) থেকে হিনওয়ারের সুলতান জামাল উদ্দীনের কাছে জাহাজে চড়ে যাত্রাকালে হিনওয়ার ও ফাকানুর দ্বীপের মাঝামাঝি একটি দ্বীপে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যুরা বারোটি যুদ্ধ জাহাজে করে ইবনে বতুতা ও জাহাজের অন্য আরোহীদের আক্রমণ করে পরাজিত করে সমুদয় জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। জলদস্যুরা ইবনে বতুতার কাছ থেকে সিংহলের রাজার দেয়া মণিমুক্তা, অলংকার এমনকি সাথে নেয়া খাদ্যসামগ্রী সবকিছুই নিয়ে যায়। তখন ইবনে বতুতার পরনে কাপড় ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছু ছিল না।[৪২]

জলদস্যুদের উৎপাত পশ্চিম ভারতীয় উপকূলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও দস্যুদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালাক্কা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পরমেশ্বর পালেমবাঙ থেকে পালিয়ে এসে যখন মালাক্কা গ্রামে আশ্রয় নেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গে পালিয়ে আসা মালয়ী সঙ্গী এবং জলদস্যুদের নিয়ে এখানে বৃহৎ জনবসতি গড়ে তোলেন বলে ডি. জি. ই. হল উল্লেখ

---

[৩৯] *C E H I*, p. 154.

[৪০] *Ibn Battuta*, p. 232.

[৪১] *C E H I*, p. 155.

[৪২] *Ibn Battuta*, p. 265.

করেন।[৪৩] হলের এ বিবরণ থেকে মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই যে এ অঞ্চলে জলদস্যুদের উৎপাত ছিল তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। মালাক্কার সুলতান ইসকান্দর শাহের[৪৪] মৃত্যুর পরে দ্বীপাঞ্চলে বসবাসকারী জলদস্যুরা মালাক্কা বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজসমূহ প্রায়ই আক্রমণ ও মালামাল লুণ্ঠন করত।[৪৫] এই জলদস্যুরা মালাক্কা প্রণালীতে প্রহরারত মালাক্কার সৈনিকদের অপহরণ করে তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত করে দস্যুবৃত্তি গ্রহণে পর্যন্ত বাধ্য করত। তখন রাইয়ূ দ্বীপপুঞ্জ, লীংগা, রোকান, জাম্বি, সিয়াক, কামপুর, ইন্দ্রোগিরি প্রভৃতি দ্বীপগুলো জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি ছিল।[৪৬] মালাক্কার সুলতান মনসুর শাহ (১৪৫৯-৭৭) এবং সুলতান আলাউদ্দিন রিয়াত শাহের সময়ে (১৪৭৭-১৪৮৮) জলদস্যুদের আবাসভূমি বলে পরিচিত এ সকল দ্বীপ মালাক্কার অধীনে আসে এবং জলদস্যুরা এসব দ্বীপ থেকে বিতাড়িত হয়।

নৌপথে দস্যুদের মোকাবেলার জন্য জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবাজ রক্ষীদের রাখা হত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় এবং পূর্বদিকস্থ অঞ্চলে সশস্ত্র বাণিজ্য দৃষ্ট হয়।[৪৭] ইবনে বতুতা ক্যাম্বে উপসাগরের মুখে অবস্থিত গাদ্ধার থেকে মালাবার যাবার প্রাক্কালে চারটি জাহাজ তার সফরসঙ্গী হয়েছিল। তিনি আল উকারি নামক যে জাহাজটিতে আরোহণ করেছিলেন সেটা একটা যুদ্ধ জাহাজের ন্যায় সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধের সময় এ সব জাহাজকে ছাদসহ এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হত যে জাহাজ চালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নাবিক কোনোভাবে শত্রুদের তীর বা নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা আক্রান্ত হত না। আল জাগির নামক অপর যে জাহাজটি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিল তাতে ৫০ জন তীরন্দাজ ও ৫০ জন আবিসিনীয় সৈন্য ছিল। ইবনে বতুতা নিজেই উল্লেখ করেছেন, ভারত মহাসাগরে নিরাপত্তার জন্য এই

---

[৪৩] D. G. E. Hall., *op. cit.*, p. 193.

[৪৪] মালাক্কা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যুবরাজ পরেমশ্বর ১৪১৪ সালে স্বপরিবারে ইসলাম গ্রহণের পরে মেগাত ইস্কান্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

[৪৫] ইমতিয়াজ আহমেদ, "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তার : বণিকদের ভূমিকা", *Rajshahi University Studies, Part A*, 1995-96, p. 32 ( hereafter cited as *R U S* ).

[৪৬] *Ibid*, pp. 32-33.

[৪৭] *C E H I*, p. 152.

হাবশি অস্ত্রধারীদের ব্যবস্থা। তিনি হাবশিদের সাগরের প্রভু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, প্রতি জাহাজে একজন হাবশি থাকলেই ভারতীয় জলদস্যুরা কাছে এগোতে সাহস পায় না।[৪৮]

চীনা জাঙ্কগুলোতে প্রায় ১০০০ লোক থাকত। কোনো কোনো জাহাজে এক হাজারের বেশি লোক থাকে। জাহাজে নিরাপত্তার জন্য তীরন্দাজ, ঢালধারী এবং তরল ধাতু নিক্ষেপকারী থাকত। জাহাজের মালিকের সম্মান একজন আমিরের সমতূল্য ছিল বলে ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন। তিনি যখন কোথাও যান, তখন তার সঙ্গে ঢাক, শিঙা প্রভৃতিসহ আবিসিনীয় ক্রীতদাসরা চলে, সাথে সাথে চলে অস্ত্রধারী কিছু লোক। যাওয়ার পথে দুপাশে অস্ত্রধারী লোকজন দন্ডায়মান থাকে।[৪৯] ইবনে বতুতা বাংলার জাহাজগুলোতে ড্রাম বাজনোর কথা উল্লেখ করেছেন।[৫০] যদিও তিনি এর কারণ হিসেবে জাহাজগুলোর পারস্পরিক অভিনন্দন জানানোর কথা উল্লেখ করেন কিন্তু মধ্যযুগে জলদস্যুদের প্রচন্ড উৎপাতের সময়ে কেবল অভিনন্দন জানানোর জন্য জাহাজগুলোতে ড্রাম বাজান হত এ মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। বণিকগণ জলদস্যুদের আক্রমন সম্পর্কে অন্য জাহাজগুলোকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের সাহায্য লাভের আশায় ড্রামগুলো যে বাজাত তা স্পষ্টত অনুমিত হয়।

### ঙ. উপনিবেশ স্থাপন

উপনিবেশ স্থাপন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সমুদ্রবাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বণিকরা উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। প্রাচীনকাল থেকে এশীয় বাণিজ্যে বাণিজ্যবসতি তথা উপনিবেশ স্থাপনের বহু উদাহারণ দৃষ্ট হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে বসতি স্থাপন করেছিল।[৫১] প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিস্তারে গুজরাটিগণ গুরুত্বপূর্ণ

---

[৪৮] *Ibn Battuta*, p. 229.

[৪৯] *Ibid*, p. 235.

[৫০] *Ibid*, p. 271.

[৫১] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১১১।

ভূমিকা পালন করেছিল।[৫২] সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ও ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের পর ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে উপনিবেশ স্থাপন নতুন রূপ লাভ করে। আরব বণিকরা গুজরাটে বহু বসতি স্থাপন করে এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে গুজরাট মুসলমানদের অন্যতম ঘন বসতিতে পরিণত হয়। মুসলমান বণিকদের প্রভাবে বহু গুজরাটি হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং এই গুজরাটি বণিকরাই আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরসমূহে বসতি নির্মাণ ও ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র মালাক্কা প্রতিষ্ঠার পূর্বে গুজরাটি বণিকদের প্রভাবে সমুদ্র, পারলাক, পাসাইসহ বিভিন্ন বন্দরে মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠে এবং ইসলামের বিস্তার ঘটে। বলা বাহুল্য মালাক্কার শাসক শৈলেন্দ্র বংশীয় যুবরাজ পরমেশ্বরের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পশ্চাতে সেখানে বসতি স্থাপনকারী গুজরাটি মুসলমান বণিকদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। মালাক্কায় বাণিজ্যরত গুজরাটি ও আরব বণিকদের কাছ থেকে মালাক্কার শাসক বাণিজ্যশুল্ক বাবদ প্রতি বছর প্রভূত পরিমাণ অর্থ লাভ করত।

বিদেশে অবস্থানকালে বাণিজ্যিক সুবিধার্থে বণিকরা মূলত বসতি বা উপনিবেশ গড়ে তুলত। প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ, নিজস্ব পণ্যের বাজার খোঁজা, মৌসুমি বায়ুজনিত অপেক্ষা প্রভৃতি কারণে বণিকদের নিরাপদ ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে অবস্থান করতে হত।[৫৩] কখনো কখনো এই অবস্থান মাসের পর মাস চলতে থাকত। এ সময়ে আরব আরবরা আরব ও ভারতীয় বণিকরা অনেক সময় দূরবর্তী স্থানসমূহে গমনের সময় আপন পরিবারবর্গকে সংগে নিত। বিদেশী বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিবারবর্গকে নিয়ে বাণিজ্য পরিচালনা ও বসবাস করতে গিয়ে তারা সেখানে নতুন বসতি গড়ে তুলত। বিদেশে অবস্থানকালে অনেকে স্থানীয় মহিলাদের সংগে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হত এবং অনেকে সেখানে বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। মুসলিম বণিকদের সম্পদ ও প্রাচুর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় রমণীরা মুসলিম বণিকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর রাজ্যগুলোতে অর্থ, প্রভাব ও প্রতিপত্তির

---

[৫২] D. R. Sardesai, *South East Asia, Past and Present* (San Francisco : West View Press, 1989),p. 55.

[৫৩] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 105-106.

জন্য মুসলিম বণিকগণ শাসক পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে সক্ষম হত।[৫৪] তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ রাজ্যগুলোতে প্রজাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর শাসকদের অপরিসীম প্রভাব ছিল। ফলে দ্বীপ রাজ্যগুলোর কোনো শাসক মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর অধিনস্থ সমস্ত প্রজাই পূর্ব পুরুষের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হত।[৫৫] এভাবে বৈবাহিক বন্ধন এবং ধর্মপ্রচারের ফলে দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক অবস্থান বজায়, পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ীক স্বার্থ রক্ষার জন্য বণিকদের সংঘবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিত। এভাবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে বাণিজ্যবসতি বা উপনিবেশ স্থাপন একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ভারতীয় বণিকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী বাণিজ্য পথগুলোর নিকটবর্তী বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়।[৫৬] খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতের গুজরাটে মুসলিম বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলীয় সর্ববৃহৎ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে মালাবার উপকূলে মসজিদ নির্মাণ এবং মুসলিম এলাকায় মুসলমানদের নিজস্ব কাজি নিযুক্ত থাকার কথা জানা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের সর্বাধিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রেসিকের নিকটবর্তী লেরানে ১০৮২ অথবা ১১০২ খ্রিস্টাব্দে একজন মুসলিম মহিলার আরবি ভাষায় লিখিত একটি কবর ফলক পাওয়া যায়, যা জাভায় মুসলিম জনবসতির প্রমাণ দেয়।[৫৭] ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মার্কো পোলো সুমাত্রা ভ্রমনকালে পার্লাকে বহুসংখ্যক মুসলিম বণিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন।[৫৮] ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা সমুদ্র বন্দরে শাফে'য়ী অনুসারী একজন মুসলিম সুলতানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখেন।[৫৯] ১৪০২ সালে শৈলেন্দ্র বংশীয় যুবরাজ পরমেশ্বর কর্তৃক মুসলিম মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পাসাই, ত্রেংগানু প্রভৃতি কেবল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নয় এক একটি বন্দর রাজ্য হিসেবে

---

[৫৪] B. R. Pearn, *An Introduction to the History of South East Asia* (Kualalumpur : Longmans of Malaysia, 1965), p. 30.

[৫৫] Thomas Arnold, *The Preaching of Islam* (Lahore : Macmillan & Co. Ltd., 1964), p. 191.

[৫৬] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১১১।

[৫৭] D. G. E. Hall, *op. cit.*, p. 190.

[৫৮] *Ibid.*

[৫৯] *Ibid*, p. 191.

প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬০] দক্ষিণ চীনে আরব মুসলমানদের ঘন জনবসতিই ছিল না, তাদের সেখানে মুসলমানগণ কর্তৃক পৃথক মুদ্রা প্রবতর্নের ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন শহরে কুফী লিপি পাওয়া গেছে। কিলওয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে একটি বৃহদাকার গুদামঘর, একটি শুল্ক হাউস এবং একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬১] এ থেকে কিলওয়াতে মুসলমানদের যে প্রভাব ছিল তা অনুমান করা যায়। এভাবে দেখা যায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং চীনের বাণিজ্যপথে বহু বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

চ. সহজ বহনযোগ্য মূল্যবান দ্রব্য

প্রাচীনকাল থেকে বিদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণত সহজে বহনযোগ্য অথচ মূল্যবান পণ্য বিনিময় হত। যাত্রাপথের বিড়ম্বনা ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সম্ভবত এই প্রকৃতির পণ্য পরিবহনের কারণ ছিল। স্থলপথে একদিকে ক্যারাভানের মাধ্যমে কম পণ্য পরিবহন, অনুন্নত রাস্তাঘাট ও ক্যারাভানের শ্লথ গতিজনিত কারণে সময়ের অপচয়, দস্যু-তস্করদের উপদ্রব, বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শুল্ক প্রদান, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি অন্যদিকে জলপথে মৌসুমি বায়ুজনিত সময়ের অপচয়, বন্দর কর্তৃপক্ষকে বারবার শুল্ক প্রদান ও জলদস্যুদের উপদ্রব প্রভৃতি কারণে বণিকদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হত। তারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে তারা এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। ফলে স্বল্প দামের পণ্য হয়ে উঠতো আকাশচুম্বি এবং তা সাধারণ মানুষের ধরাছোয়ার বাহিরে থাকত। অভিযাতবর্গ, অমাত্য ও শাসকবর্গ ছাড়া সাধারণ লোক উচ্চ মূল্যের এ পণ্য ক্রয় করতে পারত না। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্যের উপকরণ হত স্বল্প পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান জিনিস। যথা সোনার সামগ্রী, মশলা, সুগন্ধী কাঠ, রেশম ও সৌন্দর্যমন্ডিত চীনামাটির জিনিসপত্র। অত্যধিক দামের জন্য শাসক শ্রেণীভূক্ত উচ্চকূলের মানুষের মধ্যে ঐসব জিনিসের সমাদর ছিল।[৬২]

প্রাক ইউরোপীয়-আগমনকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল মশলা ও সুতি কাপড়। চীনে ভারতীয় লঙ্কা ও গোল মরিচের প্রচুর চাহিদা ছিল। মালাবার অঞ্চল থেকে এ

---

[৬০] D. G. E. Hall, *op. cit.*, p. 191.

[৬১] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 57.

[৬২] জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

গোলমরিচ ও লঙ্কা প্রধানত রপ্তানি হত। করোমন্ডল, ক্যাম্বে ও বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতি কাপড় চীনে রপ্তানি হত।[৬৩] পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে চীনে ভাল সুতি কাপড় তৈরি হত না। চীন থেকে ভারতে আসত চীনের সাদা রেশমি কাপড়, চীনামাটির বাসন, চীনামাটির কলসী ইত্যাদি। ভারত থেকে মিশরের কায়রোর বাজারে ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যে পণ্য রপ্তানি হত তন্মধ্যে মশলা বিশেষত লবঙ্গ ও গোলমরিচ, ধুনা ও সুগন্ধি দ্রব্য, চন্দন কাঠ, নীল ও লাক্ষা এবং ঔষধির গাছ-গাছড়া উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দর থেকে এসব দ্রব্য রপ্তানি হলেও অধিকাংশ পণ্য বিশেষত মশলাজাত দ্রব্য ও বিভিন্ন সুগন্ধী কাঠ আসত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরসমূহ থেকে। বাংলা ও ক্যাম্বে থেকে রপ্তানি হত মসলিন জাতীয় সুক্ষ ও অন্যান্য নানান রঙবেরঙের কাপড়। পশ্চিম এশিয়ার বণিকরা ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে নিয়ে আসত গালিচা, কিংখাব, কার্পেট, কাঁচের জিনিসপত্র, লেখার কাগজ প্রভৃতি। তবে ভারতীয় বণিকরা রপ্তানিকৃত পণ্যের বিনিময়ে পণ্য অথবা সোনার মুদ্রা গ্রহণ করত। তারা বিদেশী পণ্যের বিনিময়ে সোনার বা রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করতেন না। ভারতীয় বণিকদের এ বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারতে ব্যাপকভাবে সোনার আমদানি হত। সপ্তদশ শতকে ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের মন্তব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেন, হিন্দুস্তানের বণিকরা সোনা দিয়ে দাম শোধ না করে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিতেই অভ্যস্ত বেশি। তাঁরা পণ্যের পসরা নিয়ে জাহাজে করে দেশে-বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং সেই জাহাজে তাল-তাল সোনা বোঝাই করে দেশে ফিরেন। পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে তারা বাণিজ্যের ঋণ পরিশোধ করেন। সাধারনত সোনা দিতে চান না।[৬৪]

### ছ. মুসলিম বণিকদের আধিপত্য

ইউরোপীয় আগমনের পূর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে বিশেষত আরবদের হাতে ছিল। বিভিন্ন পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বে গুজরাট, মালাবার, করমণ্ডল এবং বাংলার বণিকদের ব্যাপকভাবে তাদের নিজস্ব জাহাজে ইন্দোনেশীয়ায় ব্যাপকভাবে যাতায়াত করার কথা কে. এন. চৌধুর

---

[৬৩] প্রভাতাংশু মাইতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

[৬৪] Francois Bernier, *op. cit.*, p. 204.

উল্লেখ করেছেন।[৬৫] অন্য একটি বিবরণে দেখা যায়, এই সময় ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে বাণিজ্য ও জাহাজ পরিচালনায় আরব ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু গুজরাট থেকে পূর্ব দিকে মালাক্কা পর্যন্ত অঞ্চলের নৌ-চালনা ও ব্যবসা ছিল অনেকটা গুজরাটিদের হাতে।[৬৬] তোম পিরেস মালাক্কার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুজরাটি বণিকদের জন্য স্বতন্ত্র শাহ্-ই-বন্দর বা পৌর অফিসার নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৭] উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে অনুমিত হয় যে, ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য মূলত আরব ও গুজরাটি মুসলিম বণিকদের প্রাধান্য ছিল।

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে মুসলমান বণিকদের আধিপত্য শুরু হয় আরব মুসলমানদের উত্থানের পর। ইসলামের আবির্ভাবের মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে মিশর পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর আরবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতি হলে এবং লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগরসহ এশিয়া-ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রাচীন পথসমূহ আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যে আরবদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা সিন্ধু জয় এবং সিন্ধুর উপকূলবর্তী এলাকায় নৌপ্রহারার ব্যবস্থা করলে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আরবদের অবাধ চলাচলের পথ নিশ্চিত হয়। গুজরাটে আরব বণিকদের বসতি স্থাপন, সেখানকার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা, বৈবাহিক সমন্ধ স্থাপন প্রভৃতির ফলে গুজরাট ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের ঘন বসতিতে পরিণত হয় এবং আরব বণিকদের পাশাপাশি গুজরাটি মুসলিম বণিকরা ভারতীয় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর সুলতান কর্তৃক গুজরাটে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হলে ভারত মহাসগরীয় বাণিজ্যে গুজরাটি বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

ত্রয়োদশ-চতুদর্শ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে ভারতীয় এবং আরব বণিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল এসময় ভারত মহাসাগরে এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রভাব হ্রাস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনে মীং বংশের উত্থানের পর চীনের বৈদেশীক নীতিতে ব্যাপক

---

[৬৫] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p. 100.

[৬৬] Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, p. 62.

[৬৭] *Tome Pires*, p. 265.

পরিবর্তন ঘটে। চীন এ সময় পূর্বেকার সামুদ্রিক আধিপত্য বিস্তার নীতি বিসর্জন দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে এবং সাম্যবাদের দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়ে। পূর্ব অনুমতি ছাড়া চীনা বণিকদের অবাধ সমুদ্রবাণিজ্যে গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়, বিশেষ করে ক্যান্টন বন্দরে বণিকদের গমনাগমনে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।[৬৮] চীনা প্রভাব হ্রাস গুজরাটি এবং আরব বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে।

ইউরোপীয়দের আগমনপূর্বে এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্যে আরব ও গুজরাটি বণিকদের আধিপত্য বজায় থাকলেও সেখানে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীর প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না। বিশেষত করমন্ডল উপকূলীয় এবং বাঙালি বণিকদের ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বহু চীনা জাহাজ এবং সব রকমের পণ্য এই বণিকদের অধিকারে ছিল। প্রতি বছর তিন থেকে চারটি জাহাজ করমণ্ডল থেকে মালাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দিত। প্রতিটি জাহাজে ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ ক্রুজাডো মূল্যের পণ্য থাকত। পুলিকট থেকে মালাক্কায় একটি বা দুটি জাহাজ যেত। প্রতিটি জাহাজে ৮০,০০০ থেকে ৯০,০০০ ক্রুজাডো মূল্যের পণ্যসামগ্রী থাকত। পণ্যগুলোর মধ্যে থাকতো দামি কাপড়সহ ত্রিশ রকমের বস্ত্র। বণিকদের মধ্যে বহু পাইকারি ব্যবসায়ী ছিল; তাদের হাতে ছিল প্রচুর পুঁজি ও মজুত দ্রব্য এবং সমুদ্রযানগুলো পরিচালনার জন্য সরঞ্জাম।[৬৯]

করমণ্ডল উপকূলের পুঁজি, নৌ-পরিচালনা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে মালাক্কায় রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন রকমের সুতিবস্ত্রের পণ্যকে ধর্তব্যের মধ্যে নিলে দেখা যায়, ঐ অঞ্চলের বণিকরা গুজরাটি বণিকদের মতই শক্তিশালী ছিল। তোম পিরেসের বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এডেন, হরমুজ, ক্যাম্বে ও বাংলার শাসকগণ মালাক্কার সুলতানের কাছে পত্র ও উপহার-দ্রব্য পাঠাতেন এবং তাঁদের দেশের বণিকগণকে সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতেন।[৭০] পারসিক, ইটালীয়, তুর্কি ও আরব বণিকগণ এবং পশ্চিম ভারতের চৌল, দাবহোল ও

---

[৬৮] Brain Harrison, *op. cit.*, pp. 57-58.

[৬৯] Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, pp. 66-67.

[৭০] *Tome Pires*, p. 61.

গোয়া থেকে আগত বহু বণিক বাংলায় বাস করত।[৭১] সুতরাং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশীয় বণিকদের যে অবাধ যাতায়াত ছিল উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

অবশ্য এশিয়ার এ সমুদ্রবাণিজ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অংশগ্রহণ অনেকটা সীমিত ছিল বলে মনে হয়। এজন্য ভারতীয় মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক সমুদ্রবাণিজ্যে অংশগ্রহণ থেকে হিন্দুদের বঞ্চিত করা বা সমুদ্রযাত্রা হতে বিরত রাখা ছিল না, বরং সমকালীন হিন্দু সমাজব্যবস্থা এর জন্য দায়ী ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার এ প্রসংগে বলেন, প্রাক-মোগল যুগে শূলপাণি, বৃহস্পতি, রঘুনন্দন প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ স্মৃতি-নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে হিন্দুদের জীবনকে আচার-সংস্কারের গন্ডীর মধ্যে সীমিত করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।[৭২] এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সম্ভবত ব্রাহ্মণ সমাজে এবং হিন্দু সমাজের অন্যান্য অংশেও রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। Meilink-Roelofsz বলেন, গুজরাটের হিন্দু বণিকগণ অর্থ ও পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে মুসলমান বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত ; তবে তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বাধা এড়িয়ে মুসলমানদের জাহাজে উঠে ব্যবসা করতে পারত না।[৭৩] বাংলার হিন্দু বণিকগণও সম্ভবত অনুরূপ আচারানুষ্ঠানের বাধার কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেত না। অথচ করমন্ডল উপকূলের হিন্দু বণিকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে তাদের ঐ ধরণের কোন বাধা ছিল না।

### জ. বিদেশী বণিকদের সুযোগসুবিধা দান ও নিরাপদ বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে আগত বিদেশী বণিকদের রাষ্ট্রীয় বা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হত। বিদেশী বণিকদের প্রতি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র বা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদানের পশ্চাতে শাসকবর্গের বা বন্দর প্রধানের অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টি জড়িত ছিল। বন্দরে আগত বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে পণ্যের শুল্ক, আবাসিক সুযোগ সুবিধা প্রদান, পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বাবদ শাসকবর্গ, স্থানীয় রাজা এবং বন্দর প্রধানরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। এজন্য শাসকবর্গ ও স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরে বিদেশী বণিকদের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ

---

[৭১] *Tome Pires*, p. 88.

[৭২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১১৫।

[৭৩] Meilink- Roelofsz, *op. cit.*, pp. 63-64.

সুবিধার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখত। মালাবার উপকূলীয় বন্দরসমূহে যারা ঘন ঘন আসত এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করত তারা নিষ্কর সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মত বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। কালিকটে বসবাসরত মুসলিম বণিকদের নিজস্ব গভর্নর ছিল। তিনি কালিকটের রাজার হস্তক্ষেপ ছাড়াই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং অপরাধের শাস্তি বিধান করতেন। তিনি রাজাকে কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে রাজাকে অবহিত করতে বাধ্য ছিলেন।[৭৪] দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কা বন্দরে বিদেশী বণিকদের বাসস্থান, যাতায়াতের বন্দোবস্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য চারজন বন্দরকর্মী নিযুক্ত থাকত যারা 'শাহবন্দর' নামে অভিহিত ছিল।[৭৫] আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য মুসলিম বন্দরে ভেনেসীয় ও অন্যান্য বিদেশী বণিকরা ১২৩৮ সাল থেকে সুলতানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজেদের মধ্যে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করত। [৭৬]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাসকগণ বিদেশী বণিকদের নিরাপদে বাণিজ্য পরিচালনায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সুলতান বলবন দস্যুতস্করদের হত্যা, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে, দস্যুদের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত বনজঙ্গল পরিস্কার করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপনসহ সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থলপথে বণিক ও পথিকদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করেছিলেন। বলবনের রাজত্বকালের দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে দস্যু-তস্করদের উপদ্রব ছিল না বললেই চলে। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে সমুদ্রপথেও বণিকরা নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারত। সমুদ্র উপকূলবর্তী ছোট ছোট রাজ্য এবং বন্দরগুলোর উপর সাধারণত কেন্দ্রীয় শাসকদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই রাজ্যগুলোর অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। বন্দর ব্যবহার, জাহাজ ভাড়া দেওয়া, পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, আবাসিক সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রভৃতি বাবদ বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে উপকূলীয় রাজ্যের শাসক ও বন্দর কর্তৃপক্ষরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। ফলে বিদেশী বণিকদের যাতায়াতে এবং পণ্য পরিবহণে যাতে কোনো ঝুঁকির সম্মুখিন হতে না হয়

---

[৭৪] K. S. Mathew, *op. cit.,p.* 18.

[৭৫] জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩।

[৭৬] K. S. Mathew, *op. cit.,p.* 18.

সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা হত। প্রায় প্রত্যেক স্থানীয় রাজার নিরাপত্তা বাহিনী থাকত যারা উপকূলে বিদেশ থেকে আগত বণিকদের নিরাপদ চলাচলে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাইটমার রটরমনও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি মধ্যযুগে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে বণিকদের নিরাপদ বাণিজ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে ঐ বৈদেশিক বাণিজ্যকে শাসকশ্রেণীর নাগালের বাহিরে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর মতে ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ও স্থানীয় শাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।[৭৭] এদের কেউ কেউ স্বাধীন, আবার কেউ কেউ কেন্দ্রীয় শাসকের স্থানীয় গভর্নর ছিল। শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে এরা সবসময়ই অত্যধিক নমনীয় ছিল। নমনীয় হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তরও ছিল না। কারণ কঠোর হলেই বণিকরা সহজেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে সরিয়ে নিতে পারত, যেখানে স্থানীয় শাসকরা আরো সহজ শর্তে বাণিজ্য করার জন্য এদের স্বাগত জানাত।[৭৮] তাই নয়, বন্দর শাসকগণ বিদেশী বণিকদের জাহাজ নিয়ে তাদের বন্দরসমূহে আসতে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করত। বণিকদের দেখাশুনার জন্য পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করা হত। মালাক্কা বন্দরে বিদেশী বণিকদের দেখাশুনা ও সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য শাহবন্দর নামক কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকত। ফলে বণিকগণ এক বন্দরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা না পেলে অন্য বন্দরে চলে যেত। এ সব কারণেই ইউরোপীয় বণিক শ্রেণীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আগে এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রেরিত বণিকদের জাহাজ কখনও যাতায়াত পথে বাধাপ্রাপ্ত হত না। বাণিজ্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ থাকার ফলে দূরপাল্লার বাণিজ্যে খাদ্যশস্য পর্যন্ত স্থান লাভ করে।

### ঝ. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে প্রথম যে মৌর্য নামক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি কৃষি-অর্থনীতি হলেও তখন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি

---

[৭৭] ডাইটমার রটরমন, *এশীয় বাণিজ্য ও বেনেবাদ যুগে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ*, অনু. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ.১০।

[৭৮] তদেব।

ঘটেছিল। ইতিপূর্বে মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি দিয়ে পাটালিপুত্র নগরে বহু বিদেশী বাস করার কথা বলা হয়েছে। এই বিদেশীদের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক অবশ্যই ব্যবসায়ী ছিল তা মেগাস্থিনিসের অপর একটি বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয়। মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেন যে রাজধানীতে পৃথক একটি বোর্ড ছিল যার কাজ ছিল বাণিজ্য, ওজন ও পরিমাপের তত্ত্বাবধান করা। বাণিজ্যতরীগুলো তখন সমুদ্রপথে শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ (বার্মা) এবং দক্ষিণ আরবে যাতায়াত করত। বিহারের দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রখনি আবিস্কৃত হওয়ায় তখন তাম্রবন্দর, তাম্রলিপি থেকে ব্যাপকভাবে ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে তাম্র রপ্তানি করা হত।[৭৯]

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে রোমানদের আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ রূপ লাভ করে। রোমানরা এই সময় ভারত থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রেরণ করত। রোমান আমলে প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিশেষত মশলার চাহিদা রোমে খুব বেড়ে যায়। মালাবার উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মশলার উৎপাদন হলেও রোমানদের চাহিদার তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। রোমানদের মশলার বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়। স্বর্ণ, মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং কাঠ, যা রোম চাইত, সবই এ অঞ্চলে পাওয়া যেত। এভাবে মশলা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ রাজ্যগুলোতে ব্যাপকভাবে যাতায়াত করতে থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির পশ্চাতে এর অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খিষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বেই চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মনিমুক্তা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের জন্য চীনের ব্যাপক চাহিদা ছিল। বিপরীতক্রমে চীনের রেশমবস্ত্রের ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল।[৮০] চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ভারতের সমুদ্রযাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা সমুদ্রপথে চীনে যেতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরকে ছুঁয়ে যেতে হত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত বৃদ্ধির ফলে এবং ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে ভারতীয় বণিকরা মূল ভূখণ্ডের এবং দ্বীপাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বসতি

---

[৭৯] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

[৮০] তদেব, পৃ. ১০৮।

স্থাপন শুরু করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের সূচনা ভারতীয় যুবরাজ বা বণিকরা করেছিলেন এমন কথাও প্রচলিত আছে।[৮১] ব্রহ্মদেশে ইরাবতি নদীর বদ্বীপে এবং যবদ্বীপের (জাভা) বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে কলিঙ্গগণের নাম জড়িত হয়ে আছে। কম্বোডিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবর্তক হিসেবে ভারতীয় কৌণ্ডিন্যর নাম সুপরিচিত। তিনি কম্বোডিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন।[৮২]

তৎকালীন চৈনিক ইতিবৃত্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ফুনানের নাম প্রথমে উল্লেখ করা যায়। ভারতের পূর্ব উপকূলের প্রায় সব নৌবন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মালয় উপদ্বীপেও ভারতীয়গণ বসতি স্থাপন করেছিল। তাম্রলিপি ও অমরাবতী থেকে জাহাজ তখন ব্রহ্মদেশ, মার্তাবান এবং ইন্দোনেশিয়ায় যেত। দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলো থেকে জাহাজ যেত টেনাসেরিম, ট্রাঙ্গে এবং মালাক্কা প্রণালীতে। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলোও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে অংশ নিত।[৮৩] ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে স্থলপথ ও নদীপথে বিভিন্ন মালামাল সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে এসে জমা হত এবং জাহাজ যোগে অতঃপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে চলে যেত। একইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সমুদ্র পথে মশলা ও অন্যান্য সামগ্রী ভারতের সমুদ্র উপকূলীয় বন্দর হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাহিরে চলে যেত।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যে আরবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হলে তাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। আরব বণিকরা বিশাল আরব সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এবং ইউরোপীয়দের জন্য পণ্য সংগ্রহকল্পে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এবং চীনে যাতায়াত করতে থাকে। বাণিজ্যপথ হিসেবে তারা জলপথকে প্রাধান্য দেয়। তারা লোহিত সাগর অথবা পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এবং চীনে পৌঁছিত। এই বাণিজ্যপথে দক্ষিণ এশিয়ার গুজরাট, কালিকট, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি যে সব দেশ পড়ে যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে তাদের

---

[৮১] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

[৮২] *তদেব*।

[৮৩] তদেব, পৃ. ১১১।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। বাণিজ্যিক সুবিধার্থে আরব বণিকরা অনেকেই গুজরাট, বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকায় বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রুসেড, ইউরোপে রেনেসাঁসকালীন মশলার চাহিদা বৃদ্ধি, মঙ্গোলদের আক্রমনে আব্বাসীয় খিলাফতের ধ্বংশ সাধন প্রভৃতি কারণে চৌদ্দ-পনের শতকে আলেকজান্দ্রিয়া-জেদ্দা-এডেন-ক্যাম্বে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথটি যখন বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়, তখন মালাবার উপকূল, করোমণ্ডল উপকূল ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদেই চৌদ্দ শতকের দিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্যাম্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরের বিকাশ ঘটে। এই বন্দর দুটো ছিল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইউরোপ, আরব, পারস্য ও ভারতের পণ্য যেমন ক্যাম্বে থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যেত, তেমনি আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের দ্রব্যাদি বিশেষ করে মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য, রেশম মালাক্কাকে কেন্দ্র করে ভারত, শ্রীলংকা, আরব ও ইউরোপে পৌঁছিত।[৮৪]

উপরন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ভারতে সুলতানি শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রার পার্লাক, পাসেই এবং জাভার গ্রেসিক প্রভৃতি বন্দর রাজ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সুমাত্রার বন্দরসমূহই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৪০২ খ্রি.) মেগাত ইসকান্দর শাহের নেতৃত্বে শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য মালাক্কা প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বীপাঞ্চলীয় বাণিজ্যের উপর মালাক্কার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এসব মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে সুলতানি ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

---

[৮৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১১৩।

পর্তুগিজদের আগমনের প্রাক্কালে মালাক্কা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। মালাক্কাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য আবর্তিত হত। মালাক্কা থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বাংলা, মালাবার উপকূল ও করোমণ্ডল উপকূলীয় বিভিন্ন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে আসত। তোম পিরেসের বিবরণে মালাক্কার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক লেনদেন অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে। তোম পিরেস মালাক্কাতে চার থেকে পাঁচ হাজার গুজরাটি বণিক যারা নিয়মিত যাতায়াত করত তারা ব্যতীত প্রায় এক হাজার গুজরাটি বণিকের মালাক্কায় বসবাস করার কথা বলেছেন।[৮৫] তোম পিরেসের বিবরণ থেকে আরো জানা যায়, মালাক্কার কর্তৃপক্ষ গুজরাটিদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র শাহবন্দর নিযুক্ত করেছিলেন। গুজরাটি বণিকরা বছরে কমপক্ষে চারটি পণ্যভর্তি জাহাজ নিয়ে মালাক্কায় আসত[৮৬]। তোম পিরেসের উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হতে গুজরাটের সঙ্গে মালাক্কার কত গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা সহজে অনুমেয়। গুজরাট থেকে বণিকরা যে সব পণ্য মালাক্কায় নিয়ে যেত তন্মধ্যে ত্রিশ রকমের কাপড়, খয়ের গোলাপ জল, আফিম, শস্যবীজ, ছোলা, কারুকার্যময় বস্ত্র ও সুগন্ধি। মালাক্কা থেকে তারা সংগ্রহ করত তারা সুগন্ধী কাঠ, মশলা, চীনা মাটির জিনিস, বুটিদার বস্ত্র, রেশম, স্বর্ণ ও টিন। ক্যাম্বে এবং গুজরাটের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক বিনিময় লক্ষ্য করে তোম পিরেস মন্তব্য করেন, ক্যামবে ছাড়া মালাক্কা এবং মালাক্কা ছাড়া ক্যাম্বে বাঁচতে পারে না।[৮৭]

ক্যাম্বের পরেই মালাক্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক লেনদেন হত করোমণ্ডল উপকূলীয় বণিকদের। করোমণ্ডল উপকূল থেকে তখন প্রতি বছর তিন চারটি এবং পুলিকট বন্দর থেকে একটি দুটো জাহাজ মালাক্কায় যেত। পুলিকটের বণিকরা মালাক্কায় গুজরাটের তৈরি বস্ত্র নিয়ে যেত এবং বিনিময়ে মালাক্কা থেকে সংগ্রহ করত শ্বেত চন্দন, কর্পুর, ফিটকিরি, সাদা রেশম, মশলা, বুটিদার বস্ত্র, চীনা জরি এবং স্বর্ণ।[৮৮] পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বে বাংলার সঙ্গেও মালাক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক বছর অন্তত একটি জাঙ্ক জাহাজ বাংলা থেকে মালাক্কায় যেত। কোনো কোনো বছরে দুবারও

---

[৮৫] *Tome Pires*, p.45.

[৮৬] *Ibid*, pp. 265, 269.

[৮৭] *Ibid*, p. 45.

জাহাজ যেত। চার বা পাঁচটি জাহাজ করে এদেশের পণ্য সরাসরি রপ্তানি হত মালাক্কায় ও সুমাত্রার অন্ত র্গত পাসাই-এ। তোম পিরেসের বিবরণে থেকে বাংলার সঙ্গে মালাক্কা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তোম পিরেসের বিবরণে বলা হয়েছে, বাংলা থেকে মালাক্কায় সুক্ষ্ম সাদা কাপড়, রঙিন ও কাজ করা কাটো মশারি, দেয়ালে ব্যবহারযোগ্য, কারুকার্যখচিত বস্ত্রসজ্জা, ইস্পাত, চিনিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন রকমের প্রচুর খাদ্য, সংরক্ষিত হরিতকী, আদা, কমলালেবু, বরই, ডুমুর, কুমড়ো ও ভারতীয় লাউ ও অন্যান্য ফল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি হত। রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে আর ছিল কাল মাটির তৈরি কড়া গন্ধযুক্ত বাসন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলার সুতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। সে জন্য মালাক্কায় এদেশের সুতিবস্ত্রের খুব চড়া দাম ছিল। বার্মা, বোর্ণিও, জাভা ও জাপানের লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জে বাংলার সুতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। মালাক্কা থেকে বাংলায় আসত বোর্ণিওর কর্পূর ও গোলমরিচ, লবঙ্গ, জৈত্রি, জায়ফল, চন্দন কাঠ, রেশম, মুক্তা, সাদা পোর্সেলিন, তামা, টিন, সীসা, পারদ, লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জের বড় বড় সবুজ পোর্সেলিন, এডেনের আফিম, সাদা ও সবুজ রঙের বুটিদার কাপড়, চীন থেকে আনা সুক্ষ্ম বস্ত্র, উজ্জল লাল রঙের টুপি ও গালিচা। আরো আসত জাভার ছোরা ও তলোয়ার জিনিসপত্র।[৮৯]

উল্লেখিত আমদানি-রপ্তানির তালিকা থেকে দেখা যায় বাংলার আমদানি দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বিলাসদ্রব্য। রপ্তানি দ্রব্যের সব কিছু ছিল অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। মালাক্কা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরাকান ও পেগু থেকে বাংলাদেশে পদ্মরাগমণি এসেছে। টেনাসেরিম বন্দরের মাধ্যমে শ্যাম দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক লেনদেন চলেছে। জাভার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল উভয়মুখী। অনেক বাঙালি মুসলমান জাভায় বসবাস করেছে। জাভার গ্রেসীক বন্দরের মানুষরা প্রচুর পরিমাণে বাংলার পণ্য কিনত। বাংলার সিনাবাফ এবং সুক্ষ্ম সাদা কাপড় বান্দা দ্বীপপুঞ্জে সমাদর পেয়েছে। মালাক্কার মানুষ বাংলার সাদা ষাড় ও গরুর লেজ খুব পছন্দ করত এবং পরম উৎসাহে তা কিনত।[৯০]

---

[৮৮] জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

[৮৯] *Tome Pires*, pp. 92-93.

[৯০] জহর সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম ছিল সমুদ্রপথ। গুজরাটি ও করোমণ্ডল উপকূলের বণিকরা পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে আগত পণ্য জাহাজে উঠিয়ে অনুকূল মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিত। পথিমধ্যে বাংলার বন্দরসমূহে তারা যাত্রাবিরতি করত এবং পণ্য ক্রয়বিক্রয় করে পুনরায় জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হত এবং মালাক্কা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর রাজ্যগুলোতে পৌঁছিত। পিরেসের বিবরণে ইরানি, ইতালীয়, তুর্কি, আরব এবং পশ্চিম ভারতের চৌল, দাবহোল ও গোয়া থেকে আগত বণিকদের বাংলায় বসবাস করার কথা জানা যায়।[৯১]

দক্ষিণ এশিয়ার বণিকরা বাণিজ্যিক স্বার্থে বিভিন্ন বণিক সমিতি গড়ে তুলত। তোম পিরেসের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম ভারতীয় বণিকগণ প্রথমে মালাবার উপকূলের কালিকটে এবং পরে বাংলায় কোম্পানি বা বাণিজ্যিক সংঘ গঠনে তৎপর হত। অবশ্য ভারতীয় বণিকদের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের গুরুত্ব অনেকাংশে কম ছিল। মমতাজুর রহমান তরফদার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের দূর্বলতার পিছনে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন- অনুজ্জল ভাবমূর্তি, বাণিজ্যিক সংস্থার অভাব, বাণিজ্য পুঁজি গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্রযান পরিচালনা সংক্রান্ত প্রযুক্তির অভাব, নিম্নমানের বাণিজ্যিক নীতিবোধ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে বাঙালি বণিকগণ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়।[৯২]

---

[৯১] *Tome Pires*, p. 88.

[৯২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১৩৯।